Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – I, Issue-III, published on July 2021, Page No. 1 –8
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 - 0848

ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদার

অদিতি দাস
গবেষক, বাংলা বিভাগ
ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়

Keyword
বাংলা কথাসাহিত্যিক, দুর্বোধ্য, চিত্রশিল্পী, ফরাসি ভাষার সুপণ্ডিত, নাট্যকার, ব্যাকরণ লঙ্ঘনকারী, শব্দ দিয়ে চিত্র নির্মাতা

Abstract
বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে অন্যতম হলেন কমলকুমার মজুমদার। অগাধ পাণ্ডিত্য ও পরিশ্রমী হওয়া সত্ত্বেও তিনি আমাদের উপহার দিয়েছেন মাত্র আটটি উপন্যাস। যেগুলো মূলত প্রকাশিত হয়েছিল ছোট পত্রিকায়। উপন্যাস গুলি প্রকাশের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর পাঠকের সংখ্যা অন্যান্য সাহিত্যিকদের তুলনায় কম। হয়তো তিনি সচেতন ছিলেন তাঁর রচনারীতি বৃহত্তর পাঠকদের জন্য নয়। তাঁর প্রথম গল্প আর প্রথম উপন্যাস রচনার মধ্যে আমরা বাইশ বছরের পার্থক্য দেখতে পায়। এইসময় তাঁর জীবনে নানান ঘটনা ঘটতে আমরা দেখি। প্রথমে তিনি ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করে বিলাস বহুল জীবন কাটাতে আরম্ভ করেন। এইসময় হলিউড তারকা চার্লস বার-কে তাঁর আদর্শ হিসেবে আমরা দেখি। জাপানি বোমার ভয়ে রিখিয়া চলে যান সপরিবারে। এই জায়গার প্রভাব তাঁর লেখায় দেখা যায়। কলকাতার দাঙ্গা, মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। স্যাঙ্গুভেলি রেস্টুরেন্টে আড্ডায় অংশ নেন। ফরাসি পরিচালক জ্যঁ রেনয়া কলকাতায় এলে তাঁর ছবির শুটিং থেকে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ফ্রিল্যান্স বিজ্ঞাপন শিল্পী, ইংরাজি-ফরাসি গল্পের অনুবাদ করে, বাজারচালু ফিচার জাতীয় রচনা লিখে, প্রাইভেট টিউশনি পড়িয়ে, সিগনেট প্রেসের শিল্পনির্দেশকের চাকরি করে টাকা রোজকারের চেষ্টা করেন। সত্যজিৎ রায়ের 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রে শিল্পনির্দেশনা ও ডিটেলের কাজ করেন তিনি। ভারত সরকারের জনগণনা বিভাগে কাজে যুক্ত হন। 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' ও 'মুক্তধারা' নাটক তাঁর পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। ডিটেকটিভ পাক্ষিক পত্রিকা 'তদন্ত' সম্পাদনা করেন, এইরকম আরও কিছু ঘটনা উপন্যাস রচনার পূর্বে তাঁর জীবনে ঘটেছিল। অন্যদিকে বাংলা উপন্যাসের জন্ম থেকে ক্রমশ এর বিবর্তন আমরা বুঝে নেবার চেষ্টা করেছি। 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' হয়ে শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিভিন্ন কমিউনিস্ট লেখক হয়ে মানিক, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ী হয়ে আমরা কমলকুমারের উপন্যাসে পৌঁছে দেখতে পায় তিনি তাঁর অগ্রজদের থেকে সরে এসে নিজের মতো করে সাহিত্যের জগত তৈরি করে নিয়েছেন। এখানে আমরা দেখি ফরাসি সাহিত্য তাঁর শৈল্পিক মনকে প্রভাবিত করেছিল। তাঁর চিত্রধর্মী মন শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে গিয়ে বাংলা ব্যাকরণকে উল্টে পাল্টে উপন্যাসের ভাষাকে জটিল করে তুলেছে। তিনি তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে পাঠকের এতদিনের পড়বার অভ্যাসে বড় রকম ধাক্কা দেন।

সূচনা : বিংশ শতাব্দীর একজন কথাসাহিত্যিক হলেন কমলকুমার মজুমদার। অসাধারণ কিছু ছোটোগল্পের পাশাপাশি উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস ও তথ্যসমৃদ্ধ কিছু প্রবন্ধের স্রষ্টা তিনি। এর বাইরেও তিনি ছিলেন একজন চিত্রকর, নাট্যকার, নাট্যনির্দেশক। এখানেই শেষ নয়, লোকশিল্পের গবেষক, ফরাসি ভাষায় সুপণ্ডিত এবং অঙ্কে আগ্রহী একজন মানুষ হিসেবেও তাঁর পরিচিতি ছিল। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত তাঁর 'উপন্যাস সমগ্র'-এর ভূমিকায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমাদের জানিয়েছেন তিনি ছিলেন একজন উত্তম পড়ুয়া, তাঁর সময়ে এবং একশো বছরের বাংলা গদ্য সাহিত্য ছিল তাঁর নখদর্পণে। তিনি বাংলা ভাষার প্রচলিত অবয়বের পরিবর্তন ঘটিয়ে নিজস্ব একটি শৈলী তৈরি করেছিলেন। মূলত জীবন রহস্য অনুসন্ধানের আলেখ্য তাঁর সাহিত্যকর্ম। পুরাণকল্পের সাধক কমলকুমারের গদ্য ও ছবির ভাষাকে পৃথক করা যায় না, আর এইখানেই তাঁর অনন্যতা।

আমরা দেখব যে তাঁর পাঠকের সংখ্যা আজকে ও তিনি যেসময় লিখছেন সেই সময়ও খুব বেশি নয়। মনে হতে পারে তিনি পাঠকের ধার ধারতেন না। সাহিত্য তাঁর কাছে সাধনার একটি জায়গা ছিল। যেখানে পাঠকের কাছে তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছেন। আমরা যেমন ঈশ্বরের সাধনা করি নিজের নিজের সামর্থ্য, আয়োজন দিয়ে তেমনই তিনি সাহিত্যের সাধনা করেছেন ভাষাকে নিজের মতো করে প্রয়োগ করে। জনপ্রিয়তা পাওয়ার কোনো সুপ্ত বাসনা তাঁর কোনো বক্তব্যেই প্রকাশ পায়নি। সমালোচকেরা বারবার তাঁর লেখার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। কেউ বলেছেন তাঁর ভাষা ঠিক নয় তো অন্যজন বলেছেন তাঁর ভাব ঠিক নয়। অনেকে মনে করেছেন তিনি অতি–পশ্চাদগামী। মনে করা হয় তাঁর সাহিত্যিক বন্ধুরা তাঁকে অমর করে রাখার ব্যাপারে বিশেষে ভূমিকা পালন করেছেন। আমাদের ভুললে চলবেনা কেউ বা কোনো কিছুই একজন ব্যক্তিকে চিরস্মরণীয় করে তুলতে পারেনা। মানুষ অন্য মানুষের মনে নিজের জায়গা করে নেয় একমাত্র নিজের কর্মের দ্বারা, কমলকুমারও এর ব্যতিক্রম নন।

কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১৯১৪ সালের ১৭ই নভেম্বর তাঁর জন্ম। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার বড়। তাঁর মা বাবা ছিলেন রবীন্দ্রভক্ত। মা রেনুকাময়ী খুব ছোটোবেলা থেকেই সন্তানদের রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পড়ে শোনাতেন। বাবা প্রফুল্লচন্দ্র কলকাতা পুলিশের অফিসার পদে নিযুক্ত ছিলেন। ফলে সন্তানদের বেশি সময় দিতে পারতেননা। মা তাঁদের যাত্রা, নাটক, চিত্রপ্রদর্শনী দেখাতে নিয়ে যেতেন। ফলে তাঁর কল্পনা শক্তির বিকাশে মায়ের ভূমিকা অপরিসীম। ১৯২২-১৯৩০ এই সময় তিনি চব্বিশ পরগণার বিষ্টুপুর 'শিক্ষাসংঘ' বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। এই বিদ্যালয়ের হেডমাস্টার রেভারেন্ড সুধীর চট্টোপাধ্যায়ের সান্নিধ্য তাঁকে খ্রিস্টান ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে সাহায্য করে। এই বিদ্যালয় ছেড়ে কলকাতার ক্যাথিড্রাল মিশনারি স্কুলে ভর্তি হলেও এখানে বেশিদিন স্থায়ী না হয়ে ভবানীপুরে সংস্কৃত টোলে ভর্তি হয়ে যান সংস্কৃত শিখতে। সংস্কৃত শেখা শেষ হলে প্রথাগত শিক্ষার জগতে ইতি টেনে দেন তিনি। এইসময় দেশ ভ্রমণের নেশা তাঁকে আকৃষ্ট করে। ছোটোবেলা থেকেই তিনি ছবি আঁকতেন, নাটক লিখতেন, পারিবারিক নাটকে অভিনয়ও করতেন। এছাড়াও ফরাসি ভাষা শিক্ষা, সেতার বাজানোর শিক্ষাও আরম্ভ হয়ে যায় বাল্যকাল থেকেই।

১৯৩৭ সালে ভবানীপুর থেকে 'উষ্ণীষ' সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে আর এইখানেই তাঁর প্রথম গল্প 'লালজুতো' প্রকাশ পায়, বাংলা সাহিত্য জগতে তিনি প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালের 'নহবৎ' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায়। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাঁর গল্প থেকে উপন্যাসে পৌঁছতে সময় লেগেছে প্রায় বাইশ বছর। মোটামুটি ভাবে তাঁর প্রথম গল্প প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর তেত্রিশ বছর বয়সে আর প্রথম উপন্যাস প্রকাশ পেয়েছে পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে। দীর্ঘ এই বাইশ বছরে তাঁর জীবনে ঘটে যায় নানান ঘটনা যা ব্যক্তি কমলকুমারকে ও সাহিত্যিক কমলকুমারকে সমৃদ্ধ করেছে।

১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি তিনি ব্যবসার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। মাছের ভেড়ি, ডি.ডি.টি. জাহাজে আমদানি-রপ্তানির ব্যবসায় প্রচুর অর্থ উপার্জন করে চূড়ান্ত বিলাসী হয়ে ওঠেন। মদ্যপানের অভ্যাস এইসময় থেকেই দেখা যায়।

বাজারের সেরা প্রসাধনী, পোশাকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। হলিউড তারকা চার্লস বার এইসময় তাঁর আদর্শ ছিলেন। ১৯৩৯ সালের ১৫ই জুন তাঁর বাবার মামা শরৎচন্দ্র রায়চৌধুরীর মৃত্যু হলে তাঁদের পারিবারিক নাটকের রীতি বন্ধ হয়ে যায়। এইসময় ভাই নীরদের সঙ্গে 'উল্কা' বাসা তৈরি করে নিজের লেখা নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯৪০ সাল নাগাদ ভাইয়ের সঙ্গেই বাড়িতে নাচ, গান, ছবি আঁকার স্কুল আরম্ভ করেন। কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীর স্বল্পতার কারণে স্কুলটি বেশিদিন চলেনি।

১৯৪১-১৯৪৬ এইসময় জাপানি বোমার ভয়ে তাঁরা সপরিবারে রিখিয়া যাত্রা করেন। এই রিখিয়া তাঁর সাহিত্য জীবনে বেশ প্রভাব ফেলেছে। তাঁর অন্যতম উপন্যাস 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' রিখিয়ার পটভূমিতেই রচিত হয়েছে। কিন্তু পরিবারে অর্থের অভাব দেখা দিলে তিনি রিখিয়া থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন চাকরির সন্ধানে। মহীশূর রোডে একা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে আরম্ভ করেন। কলকাতার দাঙ্গা, মন্বন্তর প্রত্যক্ষ করেন। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন আড্ডায় যাতায়াত আরম্ভ করেন যারমধ্যে অন্যতম ছিল স্যাঙ্গুভ্যালি রেস্টুরেন্ট। এই রেস্টুরেন্টে শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে আলোচনা হত। এই ১৯৪২-ই ভাই নীরদের মাধ্যমে কবি বিষ্ণু দে–র সঙ্গে পরিচিত হন। এইসময় কমলকুমার নিজের আঁকা ছবির প্রদর্শনীর ব্যাপারে উদ্যোগী হলেও কোনো এক অজ্ঞাত কারণে প্রদর্শনীটি সম্ভব হয়নি।

১৯৪৭-১৯৪৯ এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে তাঁর জীবনে। ৮ই মার্চ ১৯৪৭ দয়াময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪৮ সালে ফরাসি পরিচালক জ্যঁ রেনোয়া কলকাতায় আসেন তাঁর 'দ্য রিভার' ছবির স্যুটিং করতে। এই ছবির স্যুটিং থেকে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পান। ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবার কারণে এই সময়টায় তিনি পরিপূর্ণ বেকার রূপে জীবনযাপন করছিলেন। ফলে ফ্রিল্যান্স বিজ্ঞাপন শিল্পী, ইংরেজি, ফরাসি গল্পের অনুবাদের মাধ্যমে কোনরকমে কিছু রোজকারের চেষ্টা করছিলেন। টাকার জন্য 'সচিত্র ভারত' পত্রিকায় কখনও নিজের নামে আবার কখনও বেনামে বাজার চলতি কিছু ফিচার জাতীয় রচনা লেখেন। সিগনেট প্রেস-এর শিল্পনির্দেশকের চাকরি পান ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে, সঙ্গে প্রাইভেট টিউশনি আরম্ভ করেন। এই ১৯৪৯ সালেই সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। কমলকুমার সম্পর্কে স্মৃতি চারণা করতে গিয়ে সত্যজিৎ রায় জানান কমলকুমারের সিনেমা করার ইচ্ছে ছিল। শরৎচন্দ্রের 'অভাগীর স্বর্গ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস'-এর সম্ভাব্য চলচ্চিত্ররূপ নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা আরম্ভ করেন এবং অজস্র ফ্রেম স্কেচ করেন।

১৯৫০-এ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি গঠিত হয়। সিগনেট থেকে 'চলচ্চিত্র' পত্রিকা প্রকাশিত হয় কমলকুমার, সত্যজিৎ রায়, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত ও সুভাষ সেনের সম্পাদনায়। এই পত্রিকায় তাঁর 'চলচ্চিত্রে গানের ব্যবহার' প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এইসময় পরিচালক হরিসাধন দাশগুপ্ত, চিত্রনাট্যকার সত্যজিৎ রায় 'ঘরে বাইরে' চলচ্চিত্রের পরিকল্পনা আরম্ভ করেন। এই চলচ্চিত্রের শিল্পনির্দেশনা ও ডিটেলে ছিলেন কমলকুমার। এইবছর তিনি বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। 'সচিত্র ভারত' এর ২৩ ডিসেম্বর সংখ্যায় বহুরূপীর 'ছেঁড়াতার' নাটকের সমালোচনা প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

১৯৫১ সালে তিনি ভারত সরকারের জনগণনা বিভাগে অশোক মিত্রের অধীনে কাজে যুক্ত হন। এই চাকরি তাঁকে পশ্চিমবাংলার মাটির কাছাকাছি যাবার সুযোগ করে দেয়। ফলে এইসমস্ত অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। ১৯৫২ সালে সিগনেট প্রেসের কর্ণধার দিলীপ কুমার গুপ্তের নাট্যদল 'হরবোলা' প্রতিষ্ঠিত হয়। এইখানে সুকুমার রায়ের 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল', রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' তাঁরই পরিচালনায় মঞ্চস্থ হয়। 'লম্বকর্ণ' নাটকের প্রস্তুতি আরম্ভ করেন। এই বছরই অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য নিয়ে পাক্ষিক গোয়েন্দা পত্রিকা 'তদন্ত' সম্পাদনা শুরু করেন। তবে ১৪টি সংখ্যা প্রকাশের পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ললিতকলা অকাদেমি, কলকাতা শাখায় কর্মী হিসেবে যোগদানের পূর্বে তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল রুরাল আর্টস অ্যান্ড ক্র্যাফটস্– এ কিছুদিন কাজ করেন। ১৯৫২-তেই 'দেশ' পত্রিকার শিল্প সমালোচক হিসেবে ফ্রি ল্যান্স কাজে যুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে কাহিনী প্রকাশনী থেকে তাঁর 'ঈশ্বর গুপ্ত ছবি ও ছড়া' সংকলন প্রকাশিত হয়।

নানা সূত্র থেকে জানা যায় তিনি কয়েকটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছিলেন যার মধ্যে 'বাংলার সাধক' এবং 'বাংলার টেরাকোটা' নামের দুটি তথ্যচিত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ১৯৫৫ সাল নাগাদ তিনি নিজের লেখার ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করা আরম্ভ করেন। এইসময় ফ্রান্সে নতুন নভেল আন্দোলন শুরু হলে তিনি আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। এইবছরই সাউথপয়েন্ট স্কুলে চিত্রকলার শিক্ষক হিসেবে যুক্ত হন। ১৯৫৭-১৯৫৮-তে 'চতুরঙ্গ' পত্রিকায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'বারো ঘর এক উঠোন' এবং বিমল করের 'দেয়াল' উপন্যাসের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। তিনি সাউথপয়েন্ট স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে 'লক্ষ্মণের শক্তিশেল' নাটক মঞ্চস্থ করেন। দীর্ঘ এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে আমরা দেখতে পেলাম গল্প থেকে উপন্যাস রচনার মাঝের সময়টায় তাঁর জীবনের নানান ঘটনা তাঁকে বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল।

বহু প্রচারিত, অভিজাত, ব্যবসায়ী পত্রিকায় উপন্যাস গুলি প্রকাশ না করে তিনি 'এক্ষণ', 'কৃত্তিবাস' এর মতো পত্রিকায় সেগুলি প্রকাশ করেন। অল্পসংখ্যক পাঠক পেয়েই তাঁর সন্তুষ্টি দেখে মনে হয় অর্থের লোভ বা বিখ্যাত হবার আকাঙ্ক্ষা কোনটাই তাঁর ছিলনা। আবার উপন্যাস গুলি গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যাপারেও তাঁর তেমন আগ্রহ ছিলনা। তাঁর জীবনদশায় মাত্র একটি উপন্যাস 'অন্তর্জলী যাত্রা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছিল আর একটি উপন্যাস 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক' প্রকাশের প্রস্তুতি চলছিল, প্রকাশের আগেই তাঁর অকাল মৃত্যু ঘটে। তাঁর উপন্যাস গুলিকে পত্রিকা থেকে উদ্ধার করেন স্ত্রী দয়াময়ী মজুমদার। তাঁর উপন্যাস গুলি বাঙালি পাঠক ও সমাজকে সমৃদ্ধ করে চলেছে ঠিকই, সেইসঙ্গে যাঁরা তাঁর জীবনী জানতে আগ্রহী হয়েছেন তাঁরা এই নিঃসন্তান দম্পতির পারস্পরিক ভালোবাসার দ্বারাও জীবনে সমৃদ্ধ হবেন। যেভাবে দয়াময়ী দেবী লেখকের জীবনকালে তাঁর পাশে থেকেছেন এবং আমৃত্যু স্বামীর লেখালেখি, অন্যান্য সংগৃহীত উপাদান সঠিক মানুষের হাতে, সঠিক জায়গায় প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি আমাদের কাছে দৃষ্টান্ত হয়েই রয়ে যাবেন।

এবার আমরা বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব এবং কমলকুমারের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত এর রূপ কেমন ছিল বুঝে নেবার চেষ্টা করব। ইংরেজ শাসন আমাদের জীবনকে নানা ভাবে প্রভাবিত করেছে। ইংরেজদের হাত ধরেই আধুনিকতা প্রবেশ করেছে আমাদের জীবনে, চিন্তা-ভাবনায়। ইংরেজ শাসন আমাদের জীবনযাপনকে প্রভাবিত করার পাশাপাশি সাহিত্যচর্চাকেও প্রভাবিত করেছিল। মানুষের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, আত্মমর্যাদার জাগরণ, সামাজিক শৃঙ্খলা থেকে মুক্তি লাভের ইচ্ছা সবই তৈরি হয় তাদের মধ্যে আধুনিক মানসিকতা জন্ম নেবার ফলে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' গ্রন্থে উপন্যাসের উদ্ভবের যে প্রেক্ষিত আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন সেখানে তিনি আমাদের জানিয়েছেন পৃথিবীর কোন দেশের পুরনো সাহিত্যে উপন্যাসের দেখা পাওয়া যায়না, উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব হল এটা সম্পূর্ণরূপে আধুনিক সামগ্রী।

'আলালের ঘরের দুলাল'(১৮৫৮) ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'(১৮৬১-১৮৬২) এই দুটি লেখায় লেখক গদ্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এই বিবরণের ভেতর আখ্যানের অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়না। 'সমাচার দর্পণ'-এর সময় থেকেই বাংলা কাগজে এই ধরনের কাহিনীগদ্য লেখা হয়ে আসার কথা জানতে পারা যায়। এই ধরনের কাহিনীগদ্য গুলিকে অনেক সময়ই সাহিত্যের ইতিহাসে নকশাজাতীয় কৌতুক রচনা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর ধরে এইধরনের বিবরণের অভ্যাস গড়ে উঠেছিল, কিন্তু যখনই এই গদ্য বিবরণের একটি আখ্যান সম্পূর্ণ বড় আকারের উপন্যাস বা গল্প হয়ে উঠতে গেল 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র স্রষ্টার হাত ধরে ঠিক তখনই আবির্ভাব ঘটল বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'-র (১৮৬৫)। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের পর এর মুগ্ধতার দুটি কারণের কথা অনেকেই বলেছেন, তাহল এর ভাষা ও কাহিনী। এই উপন্যাস যখন প্রকাশ পাচ্ছে সেইসময় ইংরেজি শিক্ষিত নতুন পাঠকশ্রেণি কিছুটা তৈরি হয়ে গিয়েছিল যারা ইংরেজি ভাষার সমস্ত কিছুকেই বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত দেখতে চাইছিল। এই উপন্যাসের তৎসম শব্দ, সমাসবদ্ধ পদ, বিশেষণ বাহুল্য ইত্যাদির মিশ্রণে যে সংস্কৃত আশ্রয়ী গদ্য তৈরি হল সেটি পড়তে সেই সময়ের সাহিত্য পাঠকের অসুবিধা হলনা। কারণ ইংরেজি ভিক্টোরীয় বা তার আগের যে গদ্যভঙ্গি এই পাঠকদের শিক্ষার ভিত ছিল সেই গদ্যভঙ্গির স্বর তারা এই উপন্যাসে শুনতে পেল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কাহিনীগদ্য

গল্পের নির্ভরতা কাটিয়ে উঠে চরিত্রের নির্ভরতায় উপনীত হল। এই প্রক্রিয়ার ফলে 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-য় বর্ণিত বাঙালির দৈনন্দিন জীবন ও ভাষা, যে জীবন বাঙালি যাপন করে আসছিল সেই জীবনের কৌতুক মেশান মানবিকবোধের পাশাপাশি উপন্যাসের এক নতুন দেশীয় বিবরণ উপন্যাসের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে গেল। সেই সঙ্গে মঙ্গলকাব্যগুলিতে, চৈতন্যজীবনীতে, চৈতন্যের পরবর্তী পালাগানে কাহিনী বলার যে এক বা একাধিক ধরন তৈরি হয়েছিল তার সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের ফর্মের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গেল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুর দিকে আমাদের ইংরেজপুরাণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল যেগুলি পৌরাণিক স্বতঃসিদ্ধ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অংশ দিয়ে। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র যখন উপন্যাস লেখেন সেইসময় তিনি এই পুরাণকেই পৌরাণিক মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের আসরে, কীর্তনের আখরে, খেউড়ের রাতজাগা বাসরে পনের থেকে উনিশ শতকের মধ্যে আমাদের বাংলাদেশে কাহিনীর অন্য এক বিবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আমাদের আধুনিকতা এইসব বিবরণের মধ্যে উপন্যাসের কোনো উপকরণ না খুঁজে ইংরেজি উপন্যাসের একটি বাঁধাছককে আমাদের উপন্যাসের বাঁধাছক করে নেয়। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজি উপন্যাসের মডেলে যে বাঙালি ইতিহাস তৈরি করে নেন সেই মডেলেরই অন্তর্ভূক্ত হল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। অন্যদিকে শরৎচন্দ্র এই ইংরেজি উপন্যাসের মডেলের মধ্যেই ঘরোয়া বাঙালিয়ানার স্বাতন্ত্র্য তৈরি করে নিতে পেরেছিলেন। আমরা যদি দেখি তো দেখতে পাব ১৯১৪ থেকে ১৯২৮ এইসময় শরৎচন্দ্র বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে রাজত্ব করছেন। এরমধ্যে বারো বছর রবীন্দ্রনাথ কোনো উপন্যাস লিখছেন না। এইসময়টি বাংলা উপন্যাসের ফর্মের ইতিহাসের ক্ষেত্রে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা দীর্ঘ বারো বছরের বিরতির আগে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্র অবলম্বিত বাংলা উপন্যাসের আধুনিক ফর্মকে নিজের মতো করে বদলে নিচ্ছিলেন। আবার মাঝের এই বারো বছর ধরে শরৎচন্দ্র আরেক রকম করে এই ফর্মকে বদলে নিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে যেভাবে আত্মপরিচয় অনুসন্ধান করেছেন তাতে উপন্যাসের মডেল আর মডেল না থেকে আত্মবিবরণ হয়ে ওঠে। একদিকে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসের মডেলকে বাঙালি ভারতীয় ইতিহাসের কাছাকাছি আনতে চাইছিলেন আর অন্যদিকে শরৎচন্দ্র ঐ মডেলকেই বাঙালি ভারতীয় পারিবারিক জীবনের কাছে আনতে চাইছিলেন। রবীন্দ্রনাথ আমাদের সমকালীন জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজকে বুঝতে চাইছিলেন ইয়োরোপীয় উপন্যাসের ফর্মে। শরৎচন্দ্র ইতিহাসহীন, ইংরেজহীন পারিবারিক জীবনের নানা উপাদানের মধ্যে দিয়ে সাহেবিয়ানার এক বিভ্রান্ত বিপরীতে বাঙালিয়ানার বাস্তব আছে এইধরনের একটি মোহ তৈরি করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে মডেল নিয়েছিলেন আমরা শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ফর্মে ঐ মডেলকেই সবচেয়ে বেশি প্রকটিত হতে দেখি।

বাংলা উপন্যাস চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলে আমরা দেখতে পাব কোনো ঔপন্যাসিক পূর্বতনের বিরুদ্ধে কোনদিনই বিদ্রোহ ঘোষণা করেননি। কেউই কখনও ভাববার বা বলবার চেষ্টা করেননি যে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে সীমাবদ্ধতা তৈরি করে ফেলেছেন তাঁরা সেই জায়গা থেকে বাংলা উপন্যাসকে উদ্ধার করে আনতে চান। ঔপন্যাসিকরা প্রত্যেকেই একটিমাত্র ইংরেজি ইয়োরোপীয় মডেলে কাজ করেছেন ফলে কোনো বিদ্রহের উপাদান তাঁরা খুঁজে পাননা। ফলে প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু যখন কথাসাহিত্যে আধুনিকতার কথা ভাবার চেষ্টা করেন তখন তাঁরা তাঁদের পূর্বজদের অনাধুনিক ঘোষণা না করে হামসুন, গোর্কি, লরেন্সকে বাংলা উপন্যাসে আনবার কথা বলেন। আবার আমাদের কোনো কোনো ঔপন্যাসিক যখন ভাবছিলেন বাইরের ঘটনা দিয়ে নয় ব্যক্তির মনের ভেতরের ঘটনাস্রোতের বিবরণ দিয়েই উপন্যাস লেখা উচিত তখনও তাঁরা প্রশ্ন করেননা কেন এতদিন এইধরনের বিষয় অবলম্বনে উপন্যাস লেখা হলনা। তার বদলে তাঁরা বলেন ভার্জিনিয়া উলফ, জেমস জয়েসকে বাংলায় আনতে হবে।

এরপর কমিউনিস্ট লেখকরা বাস্তবতার আরো এক আলাদা পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজন অনুভব করলেন। কিন্তু এঁরাও বাংলা উপন্যাসে বাস্তবতাচর্চার অভাব কোথায় ছিল সেই নিয়ে কোনো আলোচনা করলেননা। ইনারা বাস্তবতার অন্য নিরিখ খুঁজে বার করলেন । তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহীত 'সমাজতন্ত্রী বাস্তবতা'-র দার্শনিক সূত্রের মোড়কে রাজনৈতিক সূত্র দিয়ে বাস্তবতাকে বোঝবার চেষ্টা করলেন। ফলে আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলা উপন্যাসের ফর্ম

বঙ্কিমচন্দ্রের সময় থেকেই নিয়ন্ত্রিত হয়ে আসছে বাঙালি ঔপন্যাসিকরা কোন ধরনের পাশ্চাত্য উপন্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন সেটার উপর।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে বাংলা কথ্যবাচনের এমন এক গতিময়তা আবিষ্কৃত হয় যা বাংলা উপন্যাসের এক ভিন্নতর আধুনিক নিরিখকে প্রায় আকার দিয়ে ফেলে। মানিক, বিভূতিভূষণ ও তারাশঙ্কর বাংলার এই তিন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে অন্তত বারকয়েক বিষয়ের চাপে পড়ে আধুনিকতার স্থিরীকৃত মডেল থেকে বাংলা উপন্যাস প্রায় বেরিয়ে আসছিল। তিনজনের ক্ষেত্রেই তাঁদের উপন্যাসের পটভূমিতে বিচরণশীল মানুষেরা এই ভাঙনটি প্রায় ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় উপভাষা, ল্যান্ডস্কেপের যে নির্দিষ্টতার হাত ধরে 'পদ্মানদীর মাঝি'-তে আধুনিকতার নতুন বিকল্পকে প্রায় গ্রাহ্য করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন সেখানে তিনিই আবার 'পুতুল নাচের ইতিকথা'-তে ঐ নির্দিষ্টতার অভাবে উপন্যাসে আধুনিকতার স্বীকৃত মডেলের স্তরান্তর ঘটাতে পারলেও নতুন আধুনিকতাকে সম্প্রসারিত করতে পারলেননা। এইদিক থেকে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় শেষ জীবন পর্যন্ত সেই নির্দিষ্ট ল্যান্ডস্কেপকে ছুঁয়ে গেছেন। কিন্তু তিনি বিকল্প আধুনিকতাকে সবচেয়ে বেশি গ্রাহ্য করে তুলতে পারলেও তাঁর প্রধান সাহিত্য কর্ম গুলিতে এই বিকল্প আধুনিকতাকে আকার দিতে গিয়ে তিনি আবার উপন্যাসের স্থিরীকৃত মডেলে প্রবেশ করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পায় তিনি সেইখানেই মডেল থেকে বেরিয়েছেন যেখানে 'প্রকৃতি' তাঁর বিকল্প আধুনিকতাকে মডেলের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছে। তিনি ডিটেলসের প্রতি নিষ্ঠায় আমাদের বাঙালি জীবনকে তার আটপৌরে নিসর্গকে উপন্যাসে এনেছেন। এইখানেই তাঁর উপন্যাসের টেকনিক বাংলা উপন্যাসের স্থিরীকৃত মডেলকে প্রায় ভেঙ্গে দেয়।

স্বাধীনতা উত্তরকালে যাঁরা সচেতনভাবে বাংলা উপন্যাসের প্রধান মডেলকে ভাঙতে চেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সতীনাথ ভাদুড়ী। তাঁর দুটি বিখ্যাত উপন্যাস 'জাগরী' ও 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এ ঔপন্যাসিকের বিবরণই কাহিনী বিবরণকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। যার ফলে এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের 'ইন্দিরা' ও রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে'-র আত্মজীবন কথার পর্বভাগ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে পেরেছে। ইংরেজি উপন্যাসের বৈভব আর গৌরবের কৃত্রিম মডেলে আমাদের যে ইতিহাস বঙ্কিমচন্দ্র খুঁজেছিলেন সেই ইতিহাসকেই সতীনাথ খুঁজলেন তাঁর সমকালীন রাজনীতি, মানুষজনের ইতিহাসে। আবার শরৎচন্দ্র আমাদের বাঙালি পরিবারের কাহিনীকে ইংরেজি উপন্যাসের আধুনিকতার মডেলে পরিবেশন করেছিলেন সেখানে সতীনাথ তাঁর 'জাগরী'-তে বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সত্যিকারের কাহিনী পাঠকের সামনে তুলে ধরলেন। আর তাঁর 'ঢোঁড়ায় চরিত মানস'-এ বিষয় নতুন আধুনিকতার আকার পেয়েছে ফর্মের জন্য।

এইরকম করেই বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে আমরা পাচ্ছি ঔপন্যাসিক কমলকুমার মজুমদারকে। তিনি উপন্যাসের স্বীকৃত আধুনিকতাকে অস্বীকার করেছেন অনেকটা নিজের মতো করে, তাঁর প্রধান জোর তাঁর নিজস্ব বিবরণ। তাঁর উপন্যাসে আমাদের সামাজিক জীবনের অস্তিত্বের সংকট তৈরি হয়েছে এক পৌরাণিক কৃত্রিমতার সচেতন ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে। তিনি অসংখ্য তথ্য ব্যবহার করেছেন তাঁর অনুভবের সত্যকে গড়ে তুলতে। সাধু, চলিত ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক শব্দের মিশ্রণ ঘটিয়ে এক অসাধারণ সাহিত্য বাঙালি পাঠককে উপহার দিয়েছেন কমলকুমার। পূর্বজ ঔপন্যাসিকরা যেখানে যথেচ্ছভাবে ইংরেজি সাহিত্যিকদের কাছ থেকে ধার নিয়েছিলেন সেইখানে এইপ্রথম কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিক তাঁর সাহিত্যের উৎস হিসেবে বেছে নিলেন ফরাসি সাহিত্য। তাঁর রচনাশৈলী, চেতনাপ্রবাহ, ডিটেলের কাজ আমাদের নিয়ে যায় ফরাসি সাহিত্যের কাছে। তিনি যে পরিমাণ পরিশ্রমী এবং বিভিন্ন ভাষার শিল্প সাহিত্যের কৃৎ কৌশল সম্পর্কে সজাগ ছিলেন তাতে অনেক উপন্যাসই লিখতে পারতেন কিন্তু লিখেছেন মাত্র আটটি উপন্যাস। প্রত্যেকটি উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে তিনি বাঙালি জীবনের মূলে পৌঁছতে চেয়েছিলেন এবং তিনি তা পেরেও ছেন। বাঙালির যা কিছু হারিয়ে গিয়েছে তা বুকে ধরে রয়েছে তাঁর উপন্যাসগুলি।

'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাস লেখার পর থেকে তাঁর ভাষা যত ব্যক্তিগত গঠনের জালে প্রলম্বিত হতে আরম্ভ করল ততই তা পাঠকের কাছে দুরূহ, দুর্বোধ্য হয়ে উঠতে থাকল। আনন্দ পাবলিশার্স থেকে তাঁর উপন্যাস সমগ্রর প্রথম

সংস্করণ প্রকাশিত হয় জানুয়ারি ২০০২-তে। এরপর ২০০৮ সালে তৃতীয় মুদ্রণ এবং ২০১৫ সালের নভেম্বরে ষষ্ঠ মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছে। ২০০২ সালের নিরিখে 'অন্তর্জলী যাত্রা'-এর চারটি, 'গোলাপ সুন্দরী'-এর তিনটি, 'অনিলা স্মরণে'-এর তিনটি, 'সুহাসিনীর পমেটম'-এর চারটি মুদ্রণ প্রকাশিত হয়েছিল। অর্থাৎ বাঙালি পাঠক তাঁর উপন্যাস কিনছিল এবং মনে হয় পড়ছিলও। অন্যদিকে এইসময় বাঙালি পাঠকেরা যাঁদের বই কিনতে পছন্দ করছিল তাঁরা হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, তসলিমা নাসরিন, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ। কমলকুমারের ভক্ত ঔপন্যাসিকরা এইসময় বাজার ধরার মতো করে লেখা লিখছেন। একমাত্র অমিয়ভূষণ মজুমদার তাঁর ভাষা নিয়ে পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন, কিন্তু পরে তিনি তাঁর স্বভাষায় ফিরে যান। অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারছি পাঠক কমলকুমারের লেখাকে প্রত্যাখান করেনি, তাঁকে প্রতাখ্যান করেছেন ঔপন্যাসিকরা। ফলে এর থেকে আমরা অনুমান করতে পারছি যথার্থ উপন্যাস পাঠক থাকলেও তাদের জন্য লেখার যথার্থ ঔপন্যাসিকের অভাব রয়েছে।

প্রত্যেকের মনের মধ্যে বার বার যে প্রশ্নের উদয় হয় তা হল কেন তিনি এই ভাষায় লিখলেন, তিনি উপন্যাসে যা বলতে চাইছিলেন তা বলবার জন্য এই ভাষা কি খুবই জরুরী ছিল। কোন অনিবার্যতার বশবর্তী হয়ে তিনি এই পথে অগ্রসর হলেন যার কোন পূর্ব ও উত্তরসূরি নেই। তিনি তাঁর বিশেষ কোন লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য তাঁর পূর্ববর্তীদের ভাষাকে বাতিল করেছিলেন সে বিষয়ে তাঁর কোন বক্তব্য আমাদের চোখে পড়েনি। তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকে পরবর্তী উপন্যাস গুলিতে যেমন 'পিঞ্জরে বসিয়া শুক', 'সুহাসিনীর পমেটম', 'খেলার প্রতিভা'-য় ভাষার বেশ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তাঁর ভাষা ব্যক্তিগত এমনস্তরে পৌঁছেছে যে তা ক্রমশ সংযোগহীন হয়ে পড়ে। তাঁর প্রথম উপন্যাসে বাংলা উপন্যাসের ভাষার ক্ষেত্রে এক নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিয়ে তিনি পরবর্তীতে নিজেই সেই দরজা বন্ধ করে দেন। ১৯৫০ সালের শেষের দিকে বাংলা উপন্যাসের ভাষার একটা সংকট তৈরি হতে দেখা যাচ্ছিল। একটু আগেই আমরা বিশদে আলোচনা করেছি রবীন্দ্রনাথ থেকে সতীনাথ ভাদুরী পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের রূপটি কেমন ছিল। 'চতুরঙ্গ', 'পথের পাঁচালী', 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা', 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'ঢোঁড়াই চরিত মানস'-এর ভাষা ভিন্ন ছিল। ফলে ১৯৬০ এর দশকে পৌঁছে বাংলা ভাষার মধ্যে নতুন কোনোরকম সম্ভাবনার অন্বেষণ দেখা না দিলেও উপন্যাস লেখা ও পড়া চলতে থাকে। ফলে একটা শূন্যস্থান তৈরি হয়। এইরকম পরিস্থিতিতে 'অন্তর্জলী যাত্রা' উপন্যাসের প্রকাশ বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বড় ঘটনা বলেই চিহ্নিত হয়ে রইল। জগৎ জীবন সম্পর্কে কমলকুমার তাঁর চিন্তা ভাবনাকে উপন্যাসে আনলেন এক নতুন ভাষায়।

তাঁর চিন্তার জগৎটি একদিক থেকে আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গীয় রসায়নের ধারাকে বহন করেছে। আমরা তাঁর মধ্যে প্রাক-ঔপনিবেশিক দেশীয় পরম্পরার সঙ্গে ইউরোপীয় ধারার মিশ্রণ লক্ষ্য করতে পারি। তবে ইউরোপ বলতে ব্রিটিশ নয় অনেকটা ফরাসি মনোভাব তাঁর ছিল। উপন্যাসে বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে ফরাসি ভাষার প্রভাব আছে বলে অনেক ভাষাবিদরা মনে করেছেন। তিনি নিজে অবশ্য স্বদেশীয় পরম্পরার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। 'অন্তর্জলী যাত্রা'র ভূমিকায় তিনি বলেছেন এই উপন্যাসের ভাব বিগ্রহ রামকৃষ্ণের আর কাব্য বিগ্রহ রামপ্রসাদের। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে 'অন্তর্জলী যাত্রা'র প্রকাশ পর্যন্ত কোনো ঔপন্যাসিককে আমরা এইধরনের কথা বলতে শুনতে পায়না। তিনি মূলত ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে মধ্যবিত্ত বাঙালির লেখার ভাষাকে আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু তিনি 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'-র বা চাষিদের মুখের ভাষায় না ফিরে নতুন এক ভাষার অনুসন্ধান করলেন। তাঁর কাছে ইউরোপ আর ইংল্যান্ড সমার্থক ছিলনা। ইংরেজির কর্তৃত্ব তিনি মানতে চাননি। ফরাসি ভাষা ও সাহিত্য তাঁর শৈল্পিক মনকে অনেকটা প্রভাবিত করলেও ফরাসি উপন্যাসের আন্দোলনকে তিনি পুরোপুরি সমর্থন করেননি। অথচ এই আন্দোলন সম্পর্কে তিনি খোঁজ খবর রাখতেন। এই আন্দোলনের যে উদ্দেশ্য ছিল ঘটনাহীনতা, অনুপুঙ্খ সম্পর্কে উৎসাহ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভাষার প্রচলিত কাঠামো বাক্য ও অন্বয় ভাঙা, ভাষাকে মুখ্য ভাবা সাহিত্য জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কমলকুমার এই আলোড়নকে দেশীয়ভাবে আত্তীকরণ করার চেষ্টা করেন। উপন্যাসের বিষয়ের ক্ষেত্রে তিনি দেশীয় পরম্পারার অনুসারী অথচ ভাষার ক্ষেত্রে ফরাসি, ইউরোপীয় পথানুসারী।

আমরা তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে দেখেছিলাম 'অভাগীর স্বর্গ' ও 'দেবতার গ্রাস' চলচ্চিত্রে রূপায়ণের জন্য অজস্র স্কেচ তিনি তৈরি করেছিলেন। তিনি তাঁর এই বিশেষ গুনটি তাঁর লেখাও ব্যবহার করেছেন। চলচ্চিত্রে যেমন ছোট ছোট অংশ যোগ করে অথবা আগে পরের ঘটনাকে যোগ করে করে সমগ্র অংশ দর্শকের সামনে তুলে ধরা হয় তিনিও তাঁর ন্যারেশনে, বাক্য গঠনে অনেকটা এইরকম করবার চেষ্টা করেছেন। ফলে পাঠক প্রথমে তাঁর ভাষা পড়তে বিচলিত বোধ করে। আসলে উপন্যাসের ভাষাকে তিনি দৃশ্যময় করতে গিয়ে পাঠকের এতদিনের পাঠ করার অভ্যাসকে ভেঙে ফেলে চিত্র ও কবিতার ইঙ্গিতময়তার কাছাকাছি তাদের নিয়ে যেতে চাইলেন। উপন্যাসের বিষয়বস্তুকে এবং তাঁর চিন্তাভাবনাকে ছবি, কবিতার ভাষায় গল্পর গদ্যের শিল্পে পরিবেশন করতে গিয়ে তাঁর গদ্য, বিশেষ করে অন্বয় আমাদের প্রচলিত গদ্য পড়ার অভ্যাসকে ধাক্কা দেয়।

পরিশেষে কমলকুমার ঘটনাপ্রবাহকে উপন্যাসে গুরুত্ব দেননি। হয়তো তিনি লেখার উপজীব্য হিসেবে এটিকে গৌণ মনে করেছেন। সেইজন্য লেখার ক্ষেত্রে তাঁকে অন্য কিছুকে বেশি গুরুত্ব দিতে হয়েছে। আর সেটি হল চিত্র। আমরা জানি বাস্তবিক জীবনে তিনি লেখক ছাড়াও চিত্রশিল্পীও ছিলেন। উপন্যাসে শব্দ দিয়ে ছবি আঁকতে গিয়ে তিনি প্রথমেই তথাকথিত ও প্রচলিত পদবিন্যাসকে ভেঙে দিয়ে বাক্যকে নতুন তাৎপর্য মণ্ডিত করেন। আমরা সাধারণত বাক্যের যে গঠনে অভ্যস্ত অর্থাৎ কর্তা+কর্ম+ক্রিয়া এই গঠনটি তিনি ভেঙে ফেলেন। আবার যে বিষয়ের উপর বাক্যের সার্থকতা নির্ভর করে যেমন বাক্যে পদের ক্রম, বিন্যস্ত পদের মধ্যে পারস্পরিক সংগতি এগুলিও তিনি তাঁর লেখায় তছনছ করেন। তিনি একই বাক্যে সাধু, চলিত, উপভাষা ব্যবহার করেছেন। দাঁড়ি, কমা যেভাবে ব্যবহার করেছেন তাতে তা বাংলা ব্যাকরণসম্মত হয়নি। অব্যয়, বিভক্তি, কারকের বিধিসম্মত ক্রমভঙ্গ করেছেন। এছাড়াও নামধাতুর প্রয়োগ, একটি বাক্যের মধ্যে একাধিক কাল এনেছেন, কোনও কোনও বাক্যে 'আকাঙ্ক্ষা'-র অভাব লক্ষ্য করা যায়। ফলে কাগজে রঙ দিয়ে ছবি আঁকা সহজ হলেও তাঁর ক্ষেত্রে এটি জটিল হয়ে যায় কারণ তিনি শব্দ সাজিয়ে সাজিয়ে তা প্রত্যক্ষ করে তুলেছেন।

আকর গ্রন্থ :

১। কমলকুমার মজুমদার, নভেম্বর, ২০১৫, উপন্যাস সমগ্র, কলকাতা, আনন্দ

সহায়ক গ্রন্থ :

১। দয়াময়ী মজুমদার, ২০১২, আমার স্বামী কমলকুমার, নদীয়া, আদম
২। দেবেশ রায়, নভেম্বর, ২০১৯, উপন্যাস নিয়ে, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং
৩। প্রশান্ত মাজী, ২০১৩, কমলকুমার, কলকাতা, পারুল
৪। প্রশান্ত মাজী (সম্পা), ডিসেম্বর, ২০১৭, কমলকুমার ১০০, কলকাতা, প্রতিভাস
৫। বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত, ডিসেম্বের, ১৯৮৫, কাব্যবীজ ও কমলকুমার মজুমদার, কলকাতা, নবার্ক
৬। রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, ডিসেম্বর, ২০১৫, কমলকুমার,কলকাতা পিছুটানের ইতিহাস, কলকাতা, আনন্দ
৭। শুভ মুখোপাধ্যায় (সম্পা), অগাস্ট, ২০১৩, কমলকুমার সৃষ্টি বৈচিত্রের খোঁজে, কলকাতা, প্রকাশ ভবন
৮। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১৯-২০২০, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, কলকাতা, মডার্ণ বুক এজেন্সী
৯। সুব্রত রুদ্র (সম্পা), ১৯৮২, কমলকুমার রচনা ও স্মৃতি, কলকাতা, নাথ ব্রাদার্স

সহায়ক পত্র-পত্রিকা :

১। উৎপল ভট্টাচার্য (সম্পা), কবিতীর্থ, আশ্বিন, ১৪২০
২। মানসকুমার চিনি (সম্পা), অন্যমন, কমলকুমার মজুমদার সংখ্যা, পরিসমাপ্তি সংখ্যা, ১ অক্টোবর ২০১৭